গোসানীমারীর বিবরণ

অথবা

রাজা কান্তেশ্বরের রাজধানী কমতাপুরের ভগ্নাবশেষ।

কলিকাতা।

২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য /০ এক আনা।

গোসানী মারির বিবরণ

অথবা
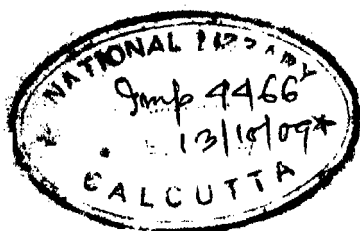
রাজা কান্তেশ্বরের রাজধানী কমতাপুরের ভগ্নাবশেষ।

কমতাপুরের বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে কামরূপের রাজাগণের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক, কেননা কামরূপের রাজা দ্বারাই কমতাপুর স্থাপিত হইয়াছিল। কামরূপের প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। ইহা একটী অতি প্রাচীন রাজ্য। এরূপ কথিত আছে যে, রাজা রামচন্দ্রের পিতামহ রঘুরাজ দিগ্বিজয় কালে এই রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যখন কামরূপ কামপীঠ, মণিপীঠ, যোনিপীঠ ও রত্নপীঠ নামক চারি অংশে বিভক্ত ছিল, তখন নরক নামক কোন একজন অনার্য্য এই সমস্ত বিভাগের রাজা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁকে রাজ্য প্রদান করেন এবং তিনিই ইহাঁকে বিনাশ করিয়া তদীয় পুত্র ভগদত্তকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, নরক এক রজনী মধ্যে আসামের পর্ব্বতটীর চতুষ্পার্শ্ব মূলদেশ হইতে উপরিভাগ পর্য্যন্ত প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলি দ্বারা গ্রথিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভগদত্ত কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ সময়ে দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি

অর্জ্জুনের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার ২৩ জন বংশধর বহুকাল এই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই বিষয় আইন আকবরীতেও উল্লিখিত আছে; কিন্তু যোগিনী তন্ত্রে কেবল ত্রয়োদশ জন রাজার বিবরণ পাওয়া যায়।

নরকের বংশ লোপ হইলে পর, খৃঃ অব্দের প্রথম শতাব্দির শেষভাগে শূদ্র বংশীয় রাজাগণ এই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। শূদ্র বংশের আদি রাজা দেবেশ্বর। তিনি ৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার পর নাগশঙ্কর এবং তৎপরে জল্পেশ্বর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। রাজা জল্পেশ্বর, জল্পেশ্বর নামক একটী শিব মন্দির জলপাই-গুড়িতে স্থাপিত করেন। আজ পর্য্যন্ত শিব চতুর্দ্দশীর দিনে তথায় একটী মেলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন এই জল্পেশ্বরের মন্দির উক্ত বংশীয় অন্যতম রাজা পৃথুর দ্বারায় স্থাপিত হয়। চাক্‌লা ও বোদা পরগণার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠ-পুরের মধ্যে পৃথুর রাজধানী ছিল। তথায় রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শূদ্রবংশ বিলুপ্ত হইলে পর, পালবংশীয় ভূপতিগণ কামরূপের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। এই পালবংশ বৈদ্যবংশীয় আদিস্থরের পূর্ব্ববর্ত্তী পালবংশ সম্ভূত বা সম্পর্কীয়। দীনাজপুরে যে মহীপাল নামক দীর্ঘিকা আছে, তাহা এই বংশীয় রাজা মহীপাল খনন করাইয়াছিলেন।

রাজা ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে এই রাজ্য ব্রহ্মপুত্রের তট হইতে তেজপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার রাজধানী ডিম্‌লার দক্ষিণাংশে স্থাপিত করিয়াছি-

লেন। প্রায় ৭০। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে একজন বৈরাগী এই রাজভবনের নিকট একটী গর্ত্ত খনন করিতে করিতে প্রস্তরে খোদিত শঙ্খ চক্র গদা-পদ্মধারী এক চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা বাসুদেব নামে অভিহিত হইয়া আজও পূজিত হইতেছে। এই রাজধানীর এক ক্রোশ পূর্ব্বে মীনাবতীর দুর্গ ছিল। মীনাবতী ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃবধূ। তিনি অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন। তাঁহারই উত্তেজনায় তদীয় পুত্র গোপীচন্দ্র ধর্ম্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন বটে, কিন্তু মীনাবতীই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। গোপীচন্দ্রের এক শত মহিষী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে হদু ও পদু প্রধানা ও রূপ লাবণ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা ছিলেন।

গোপীচন্দ্র অসার সংসার বাসনা ও রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী হইয়া, বনে গমন করিলে পর, তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। লোকে যে কথায় বলে যে "যেমন ভবচন্দ্র রাজা তেমন গবচন্দ্র মন্ত্রী" ইনি সেই প্রকার রাজা, ইঁহার মন্ত্রীও সেই প্রকার ছিলেন। ইঁহার বিষয়ে নানা প্রকার উপকথা শুনিতে পাওয়া যায়। নদীতে কোন নৌকা মগ্ন হইলে, কুম্ভকারের পাঁজা হইতে বিনির্গত ধূম মেঘের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, তিনি তজ্জন্য কুম্ভকারকে দায়ী করিতেন। এইরূপ বিচারের ফলে কোন পুষ্করিণী-চোরের বুদ্ধি কৌশলে তিনি ও তাঁহার মন্ত্রী শূলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। বাহুল্য প্রযুক্ত এ বিষয়ে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইল না। এরূপ প্রবাদ আছে যে, দেবীর

শাপে ভবচন্দ্রের বুদ্ধি বিভ্রম ঘটিয়াছিল। তিনি তজ্জন্যই রজনীতে সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন এবং নগরবাসীদিগকেও স্ব স্ব কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। দিবসে রজনীর ন্যায় সকলেই নিদ্রিত থাকিত।

তৎপরে নীলধ্বজ নামক এক ব্যক্তি এই রাজ্য লাভ করেন। ইহাঁর সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, ইনি বাল্যকালে এক ব্রাহ্মণের গোপালক ছিলেন। কিন্তু কিরূপে যে রাজা হইলেন তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। তিনি রাজা হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাঁরই পরামর্শানুসারে কান্তেশ্বর মিথিলা হইতে কএক জন সদাচারী ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া স্বরাজ্যে বাস করিতে দেন। তাঁহারাই এই ক্ষেণবংশীয় অভিনব রাজাকে হিন্দুকুলে উন্নত করেন।

গোসানী মঙ্গল নামক এক খানি এতদ্দেশীয় পদ্যময় হস্তলিপি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বেহারের দক্ষিণ জামবাড়ী গ্রামে ভক্তেশ্বর নামক এক ব্যক্তি বাস করিত। তাহার সহধর্ম্মিণীর নাম অঙ্গনা। ইহারা উভয়েই শক্তির—গোসানীমারই দেবীর উপাসক ছিল, এবং দেবীর অর্চ্চনা দ্বারাই একটি পুত্র রত্ন লাভ করে। শিশুটীর পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভক্তেশ্বরের মৃত্যু হয়। ভক্তেশ্বরের সাংসারিক অবস্থা অতিশয় অসচ্ছল ছিল, সুতরাং অঙ্গনা পতিবিয়োগে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িল, দিন চলা ভার হইল। শেষে এই পঞ্চমবর্ষীয় বালক কান্তনাথকে নিকটবর্ত্তী শশী নামক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে রাখিয়া দিল। বালক গো:

রক্ষক হইয়া প্রতিদিন গরু লইয়া মাঠে চরাইতে যাইত এবং বেতন স্বরূপ সে যাহা পাইত তাহাতেই কোন মতে অঙ্গনার ভরণ পোষণ হইত। এক দিবস নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও যখন বালক আহার করিতে বাটী আসিল না দেখিয়া, ব্রাহ্মণ বালকের অনুসন্ধানে মাঠে গমন করিলেন। তিনি মাঠে গিয়া দেখিলেন, গো সকল যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছে কিন্তু রাখালকে কোন স্থানে দেখিতে পাইলেন না। শেষে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে এক অশ্বথ বৃক্ষের তলে কান্তনাথকে নিদ্রিত ও একটি অজাগর সর্প তাহার মস্তকোপরি ফণা বিস্তার করিয়া শূর্য্য রশ্মি হইতে মুখমণ্ডল রক্ষা করিতেছে দেখিতে পাই-লেন। ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও এই অভূত পূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত ভাবে দুরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে বেলাবসানে সূর্য্য-রশ্মি স্থানান্তরিত হইলে সর্পটী চলিয়া গেল। বালকটীও কিছু ক্ষণ পরে জাগ্রত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ এবিষয় আর তাহাকে কিছু বলিলেন না। তিনি তাহার হস্ত পদের চিহ্ন দেখিয়া সামুদ্রিক জ্যোতিষ গণনা দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, এই বালক ভবিষ্যতে রাজা হইবে। এই জন্যই তিনি তাহাকে বলিলেন যে, যদি তুমি রাজা হও তাহা হইলে আমাকে মন্ত্রী করিবে কি না? কান্তনাথ নিতান্ত বিস্মিত হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ বারম্বার তাহাকে ঐ রূপে জিজ্ঞাসা করায়, সে অঙ্গীকার করিল যে, আমি যদি রাজা হই আপনাকে মন্ত্রী করিব। তৎপরে তিনি তাহাকে বাটী যাইয়া আহার

করিতে আদেশ করিলেন। তিনি তদবধি আর তাহাকে গোচারণ করিতে দিতেন না। গোসানী মঙ্গলে ইহাও লিখিত আছে যে, শ্রীবৎস রাজার রাজত্ব ধ্বংসাবধি এরাজ্য এপর্য্যন্ত রাজা শূন্য ছিল। গোসানীমারই দেবীর আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা এক রজনী মধ্যেই নগর ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং স্বয়ং দেবীই ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এই রাজ্যে বাস করিবার জন্য স্বপ্নাদেশ করেন এবং দেবীর কৃপায় কান্তনাথ এই রাজ্যের অধীশ্বর হন*। কান্তেশ্বর রাজ্য লাভ করিয়াই বিনন্দের সুকাঙ্গ, অকাঙ্গ, সুশীলা, সুশীতল ও বনমালা নাম্নী পঞ্চ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

রাজা নীলধ্বজ রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত সিংহীমারী নদীর শাখা ধল্লার তীরে কমতাপুর নামক এক নগর স্থাপিত করেন। এবং তিনি ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজাদ্বয় কমতেশ্বর এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নগরের বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইবে। ইনিই বর্ত্তমান কমতেশ্বরী বা গোসানী-মারই দেবী সংস্থাপন এবং পাঙ্গায় কোটেশ্বর ও বাণেশ্বর নামক শিব এবং সিদ্ধেশ্বরী দেবী স্থাপন করেন। দেবীর নামানুসারে এই রাজ্য কমতাপুর বা গোসানীমারী নামে প্রসিদ্ধ। নীলধ্বজের পর চক্রধ্বজ ও তৎপরে নীলাম্বর রাজা হইয়াছিলেন। রাজা নীলাম্বরের রাজত্ব সময়ে এই

---

* কান্তনাথ নাম তোর হৈল রাজেশ্বর।
আজ হইতে নাম তোর হৈল কান্তেশ্বর॥
গোসানী মঙ্গল।

রাজ্য আরও বিস্তৃত হইয়াছিল। ইনি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুবিস্তৃত রাজ-পথ ও দীর্ঘিকা দ্বারা নগরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, ও ঘোড়াঘাটে * এবং অন্যান্য স্থানে দুর্গ নির্ম্মিত করেন। ঘোড়াঘাটের দুর্গ এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। ১৩০০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে আহমেরা আসামের উত্তরাংশ দিয়া রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করতঃ কিয়দংশ অধিকার করে এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া লইয়া ছিল। বোধ হয় এই কারণেই সেই নীলাম্বর কমতাপুর সুদৃঢ় করিতেছিলেন।

রাজা নীলাম্বরের প্রধান মন্ত্রী শশীপাত্রের পুত্র মনোহর রাজ অন্তঃপুর মধ্যে গুপ্তভাবে গমনাগমন করিত। রাজা এই বিষয় কোন প্রকারে জানিতে পারিয়া এক দিন প্রহরীর দ্বারায় তাহাকে ধৃত করতঃ গোপনে তাহাকে হত্যা করেন, এবং তাহার মৃত দেহের কিয়দংশ রন্ধন করাইয়া তৎ পিতা শশীপাত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করিতে দিয়াছিলেন। মন্ত্রীর ভোজন হইলে পর, রাজা তাঁহাকে বলিলেন যে, যদি এই মাংস সুখাদ্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাটীতে গিয়া এই মাংস রন্ধন করাইয়া আহার করিবেন। এই বলিয়া মনোহরের ছিন্ন মুণ্ড তাঁহাকে দিয়া পুত্রের দোষ মন্ত্রীকে বলিলেন। কিন্তু শশীপাত্র আর কোন উত্তর না করিয়া কেবল এই মাত্র বলিলেন যে, মহারাজ! সে যে প্রকার কার্য্য করিয়াছিল তাহার উপযুক্ত ফল তাহাকে দিয়াছেন, আমি ইহার

* এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এইস্থানে বিরাট রাজার অশ্বশালা ছিল।

জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, কিন্তু আমার কোন্ অপরাধে নর-মাংস—পুত্রমাংস আমাকে ভোজন করাইলেন ? আর আমি আপনার মন্ত্রীত্ব করিব না। এই বলিয়া শশীপাত্র রাজবাটী হইতে চলিয়া আসিলেন। তৎপরে পুত্র হন্তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান মানসে তিনি সন্ন্যাসী বেশে গৌড়ের আক্‌ডাঙ্গার দুর্গের তৎকালীন সুবেদার আলাউদ্দীন হোসেন সার নিকট উপস্থিত হইয়া কমতাপুর আক্রমণের জন্য প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। সুবেদার নানা প্রকার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সেনাপতিকে কমতাপুর আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেনাপতি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া এদেশ আক্রমণ করিলেন। রাজা নীলাম্বর প্রভূত বলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা রাজাকে পরাজিত বা রাজা মুসলমানদিগকে স্বদেশ হইতে দূরীকরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। রাজা দুর্গ মধ্যে থাকিয়া, শত্রুদিগের সহিত দ্বাদশ বৎসর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যবন সৈন্য তৎকালে দুর্গ ভগ্ন করিতে পারে নাই, কিন্তু নগরের অনেক অনিষ্ট করিয়াছিল। নীলধ্বজের স্থাপিত দেবী কামতেশ্বরীর প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির ও অন্যান্য রাজ প্রাসাদ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। হোসেন সা রাজাকে পরাজিত করিতে অক্ষম হইয়া, অতি নীচ উপায়ে—বিশ্বাস-ঘাতকতা দ্বারা দুর্গ জয় করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি একদিন রাজার নিকট এক দূত দ্বারায় বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমরা দুর্গ জয়ের বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া এদেশ হইতে প্রত্যা-

গমন করিতে বাসনা করি। রাজা শঠের কপটতা বুঝিতে অক্ষম হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। ইহার কয়েক দিবস পরে সুবেদার আর এক দূতের দ্বারায় রাজাকে জ্ঞাত করিলেন যে, আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমাদের মহিলাগণ রাজরাণীদিগকে অভিবাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; রাজা এ প্রতারণা না বুঝিয়া ইহাতেও সম্মত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে দুর্গদ্বার উদ্‌ঘটিত হইল। ছদ্মবেশী শিবিকাবাহক অস্ত্র শস্ত্রে শিবিকা পূর্ণ করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে স্ব স্ব বেশ পরিগ্রহ করিয়া, বিশ্বাসঘাতক যবন রাজা নীলাম্বরকে এক লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিল। রাজার পাঁচজন মহিষী ছিলেন, তাঁহারা এই অভাবনীয় ঘটনা দর্শন করিয়া দুষ্ট যবন সেনার হস্ত হইতে মান ও সতীত্ব রক্ষার্থ স্ব স্ব গলে ছুরিকা প্রদান করতঃ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে হোসেন সা রঙ্গপুরের কিয়দংশ অধিকার করিয়া আপনার পুত্র ডানিয়েলকে এই রাজ্য প্রদান করিলেন ও তাহার রক্ষার্থ এক দল সৈন্য রাখিয়া রাজাকে লইয়া তিনি গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে রঙ্গপুর জেলার মধ্যে রাজার মৃত্যু হইয়াছিল। যেস্থানে তাঁহার পিঞ্জরাবদ্ধাবস্থায় মৃত্যু হয়, অদ্যাপি সেই স্থান পিঞ্জরঝাড় নামে খ্যাত আছে। এইরূপে ১৪৯৬ খৃঃ অব্দে হোসেন সা কর্ত্তৃক কামতাপুর ধ্বংস হয়। নীলাম্বর এই বংশের শেষ রাজা, ইঁহার পুত্র ছিল না।

যদিও হোসেন সার পুত্র এই রাজ্য শাসন করিবার জন্য

এখানে রহিলেন, তথাচ তিনি এই স্থানে অনেক দিন থাকিতে পারেন নাই। যখন বর্ষার জলে ও পাহাড় হইতে নির্গত জল প্রবাহে এই স্থান ও ইহার পথ সকল প্লাবিত করিয়া ফেলিল, আর সৈন্য গমনাগমনের পথ রহিল না, তখন পাহাড়ের নিম্নস্থ কোচ সর্দ্দারগণ ইহাদিগের আহারীয় আনয়নের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। বিনা যুদ্ধে বা সামান্য যুদ্ধে সুবেদারের পুত্র এ রাজ্য হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পথে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তিনি পলায়ন করিলে পর ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত কমতাপুর অরাজকতায় পূর্ণ হইয়া ছিল। তৎপরে ১৪৩২ শকাব্দা, ৯১৭ বঙ্গাব্দা ও ১৫০৯ খৃঃ অব্দে কোচবংশের আদি রাজা চন্দন, বৈমাত্রের ভ্রাতা বিশ্বসিংহের বাহু বলে ও বুদ্ধি কৌশলে এই রাজ্য লাভ করেন। এই সময়ে রাজা নীলাম্বরের পরিবারগণ কোন এক স্থানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার দুইটী কন্যা ছিল। ইহাঁরা দুই ভ্রাতায় দুইটী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন।

গোসানী মঙ্গল প্রণেতা কবিকান্ত রাজা নীলধ্বজকে কমতাপুরের আদি ও শেষ রাজা বলিয়া এবং রাজা নীলাম্বরের কার্য্য কলাপ নীলধ্বজের বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আসামের ইতিহাস প্রণেতা মাঃ ডব্লিউ রবিন্সন সাহেব এবং ডাক্তার ফ্র্যান্সিস বকানন সাহেব যাহা তাঁহাদিগের ইতিহাসে (মার্টিন্ ইষ্টারন্ ইণ্ডিয়া নামক ইতিহাস ৩য় ভাগে) লিখিয়াছেন তাহারই সারাংশ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত হইয়াছে এবং ১২৯১ সালে মাঘ মাসে এই রাজ্যের

ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহাই অবিকল ভ্রমণ বৃত্তান্তের ন্যায় নিম্নে লিখিত হইল।

রাজা কান্তেশ্বরের রাজধানী

কমতাপুরের ভগ্নাবশেষ।

কোচবিহার-রাজধানীর দক্ষিণ পূর্ব্বে সাত ক্রোশ দূরে কমতাপুর। রাজধানী হইতে তথায় গমন করিতে হইলে তোর্ষা নদী পার হইতে হয়। তোর্ষা, রাজধানীর তিন দিক বেষ্টন করিয়া আছে। ইহাকে বুড়া তোর্ষা বলে। এই নদীর সকল স্থানে বার মাস নৌকাদি গমনাগমনের উপযুক্ত জল থাকে না। আমরা যে স্থান দিয়া নদী পার হইলাম তথায় জলের গভীরতা ১॥০ হস্তের অধিক হইবে না। এই অল্প জলও স্রোত বিহীন নহে। তোর্ষার এক মাইল দক্ষিণে মানসাই নদী। ইহাতেও তোর্ষার ন্যায় বার মাস অধিক জল থাকে না। এই স্থানে এখন ইহার জলের গভীরতা প্রায় এক হস্ত। মানসাই সিংহীমারী নদীর অপর নাম। ইহা স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে বিখ্যাত। ইহার তীর হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে ধল্লা নদী। ধল্লা নিতান্ত ছোট নদী নহে। তাহাতে বার মাস নৌকাদি গমনাগমন করিতে পারে। বর্ষাকালে ইহার আকার ভয়ানক হয়। বল্লার জল অতি নির্ম্মল এই জন্য ইহাকে ধবলাও বলিয়া থাকে।

ধল্লা পার হইয়া কিছু দূর গমন করিলে নূতন পথের সহিত যে কমতাপুরের প্রাচীন পথ মিলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। পথের উভয় পার্শ্বে অধিকাংশ বাঁশ ও দুই চারিটী প্রাচীন বৃক্ষ আছে। তন্নিম্নেই সুবিস্তৃত শস্য ক্ষেত্র। ইহাতে তামাকের আবাদই অধিক। তৎপরে যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম তত প্রাচীন পথ কৃষি ক্ষেত্রের মধ্যে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার পর বাঁশভাঙ্গা নদী পার হইলাম। বাঁশভাঙ্গা তোর্ষাপেক্ষা ছোট নদী। এই নদী পার হইলে সূর্য্য অস্ত গেল। চন্দ্র প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু কিছু ক্ষণের পর অল্প অল্প মেঘে চন্দ্রকে আবৃত করিয়া ফেলিল। আমরা এই রূপে দেখিতে দেখিতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই তামাক ক্ষেত্র দেখা যাইতে লাগিল। অতি পরিষ্কৃত মাঠে ছোট ছোট তামাক গাছ গুলি এরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রোপিত হইয়াছে যে, যে দিক দিয়া দেখা যাউক না কেন, দেখিলে অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। কিছু দূরস্থ ক্ষেত্র গুলির প্রতি দৃষ্টি করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, কে এক এক খানি সাদার উপর কাল ফুলকাটা সতরঞ্চ বিছাইয়া রাখিয়াছে। তৎপরে আরও কিছুদূর গমন করিয়া প্রায় রাত্রি ৯॥০ টার সময়ে আমরা গোসানীমারী নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। আমরা যে বাসায় উপস্থিত হইলাম তাহার অতি নিকটেই কামতেশ্বরী বা গোসানীমারই দেবীর মন্দির। এই রজনীতেই তাহার সম্মুখস্থ স্থান দেখিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইলে আমরা পুনরায় মন্দির দেখিতে গমন করিলাম। পথের উভয় পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন সিমুল ও খেজুর বৃক্ষ সকল রহিয়াছে। ইহার পশ্চিম দিকে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। মন্দিরের সম্মুখেও নানা প্রকার বড় বড় বৃক্ষ দেখা গেল। তাহার মধ্যে একটী অশ্বথ ও একটী কুল অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরটীর চতুর্দ্দিক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইষ্টক নির্ম্মিত প্রবেশ দ্বার মাপিয়া দেখিলাম উচ্চে পাঁচ এবং পরিসর চারি হস্ত। তাহার উপর নহবত খানা। নহবত খানাটী প্রায় ২২ হস্ত উচ্চ হইবে। পূর্ব্বে ইহাতে উঠিবার জন্য ভিতর দিকে দুইটী সিঁড়ি ছিল। কিছুদিন হইল এক দিকের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলায় নহবতখানার এবং দ্বারের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণে প্রাচীরের শেষ ভাগে দুইটী বড় বড় প্রহরী গৃহ আছে। দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই সম্মুখে প্রাঙ্গণ, তাহার পর নাটমন্দির এবং উত্তরে দোল মঞ্চ দেখা যায়। দোল মঞ্চের ছাত নাই ও কোন কালে ছিল না। ইহা ইষ্টক গ্রথিত এক খণ্ড উচ্চ স্থান। ইহারই উপরে দোল হইয়া থাকে। নাটমন্দিরের ভিত্তি প্রায় চারি হস্ত উচ্চ। দৈর্ঘে ২৬ ও প্রস্থে ১৮ হস্ত। তৎপরে হোম-গৃহ। ইহা দেখিতে একটী ছোট মন্দিরের ন্যায়। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১০ ও ৯ হস্ত হইবে। নাটমন্দির এবং হোম-গৃহের মধ্যে বলি দানের জন্য অল্প পরিসর একটী স্থান আছে।

হোম্-গৃহের পর গোসানীমারই দেবীর চতুষ্কোণ মন্দির।

২

মন্দিরটী ছোট নহে। দৈর্ঘে ও প্রস্থে ১৮ হস্ত ও উচ্চে প্রায় ৩০।৪০ হস্ত হইবে এবং দেখিলে অতি দৃঢ় বলিয়া বোধ হয়। ইহার মধ্যে আলোক প্রবেশ করিবার জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত বড় চৌথুপী ঝাঁঝরী সদৃশ আলোক পথ আছে। উপরি ভাগে নানাপ্রকার কারু কার্য্য দেখা গেল। মন্দিরের মধ্যে সিংহাসনে দেবী। সিংহাসন থানি কাষ্ঠনির্ম্মিত ও চারিটী সিংহের পৃষ্ঠে সংস্থাপিত আছে। দেখিয়া অতি পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। দেবীর কোন মূর্ত্তি নাই। শুনিলাম এক থানি কবচ কৌটার মধ্যে আছে তাহারই নিত্য পূজা হইয়া থাকে। ঐ কবচ ভগদত্তের বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার সম্বন্ধে এই রূপ কথিত আছে যে, মহাদেব এই বিজয় কবচ ভগদত্তকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ইহা অঙ্গে ধারণ করিয়া যে যুদ্ধে গমন করিতেন তাহাতেই জয়ী হইতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সময়ে তিনি ব্যস্ততা প্রযুক্ত এক দিবস ইহা অঙ্গে ধারণ না করিয়া যুদ্ধে গমন করেন ও সেই দিবসের যুদ্ধেই তিনি অর্জ্জুনের হস্তে হত হইয়াছিলেন। রাজা নীলধ্বজের রাজত্ব কালের পূর্ব্বে উহা কুরুক্ষেত্রের কোন স্থানে পতিত ছিল। ঐ কবচ কিরূপে কোথায় পাওয়া যাইবে, এবং উহাকে যে দেবী কমতেশ্বরীর প্রতিরূপ ভাবিয়া পূজা করিতে হইবে, রাজা তাহা স্বপ্নে দেখিয়া, তথা হইতে আনয়ন করতঃ পূজা করেন। রাজা নীলাম্বরের রাজত্ব সময়ে গোবেন স্না কর্ত্তৃক দেবীর মন্দির ভগ্ন হইবার পূর্ব্বে দেবী স্বয়ং জলে মগ্ন হইয়াছিলেন। পরে বর্ত্তমান রাজবংশের ষষ্ঠ মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্ব

কালে, ভুনা নামক এক ধীবরের জালে দেবী পতিত হইয়া- ছিলেন। ভুনা দেবীকে জল হইতে তুলিতে পারে নাই। দেবী যে তাহার জালে আবদ্ধা হইয়াছেন, সে তাহা স্বপ্নে দেখিয়া রাজাকে জ্ঞাত করে। রাজা এক জন ব্রাহ্মণ ও একটী হস্তী প্রেরণ করিয়া দেবীকে জল হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন, এই কবচ দর্শন করা নিষিদ্ধ এই জন্য ইহা কেহ দর্শন করে না *।

মন্দিরের দ্বারের শিরোভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটী এক খণ্ড প্রস্তরে খোদিত আছে :—

সম্মত্যা বিষদেক জিষ্ণরভুজা দণ্ড প্রতাপার্যাম।
ক্রীড়াকন্দুক বেগ বৰ্দ্ধিত যশঃ শ্রীপ্রাণভূমিপতেঃ॥
শাকাব্দে নগ নাগ মার্গণ মিতে জ্যোতির্ম্মিতে নির্ম্মিতঃ।
শ্রীভাজা কবি মণ্ডলেন ভবতা ভবোভবানী মঠঃ॥

মন্দিরের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব পার্শ্ব প্রস্তে ৯ হস্ত পরিমিত রক দ্বারা বেষ্টিত ইহার নিম্নেই পুষ্পোদ্যান। তৎপরে প্রাচীরের শেষ সীমা। প্রাচীরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে মহাকাল এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কমতেশ্বর নামক পূর্ব্বোক্ত প্রহরী গৃহের ন্যায় দুইটী শিব মন্দির আছে। গৌরী পীঠ যত প্রাচীন শিব তত প্রাচীন কালের বলিয়া বোধ হয় না। এই দুইটী মন্দির মধ্যে একটী ছোট ও একটী কিছু বড় প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তি দেখা গেল। এই দুইটী মূর্ত্তি ও গৌরী পীঠ কমতেশ্বর রাজার নির্ম্মিত। দক্ষিণে মন্দির সংলগ্ন ভোগ-গৃহ। ইহার পশ্চিমে একটী তপস্বী

* *See* Martin's Eastern India. Vol. III. Page 364.

ও একটী চাঁপা বৃক্ষ আছে। তপস্বী বৃক্ষটীর মূলদেশ ইষ্টক দ্বারা বাঁধান। প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূমি খণ্ডের পরিমাণ উত্তর দক্ষিণে ৮০ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৫৬ হস্ত।

মহারাজ প্রাণনারায়ণ ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে ১৫৮৭ শকাব্দে ইহা নির্ম্মাণ করেন। ইহার প্রাচীরাদি সমস্ত ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেবল প্রাচীরের কিয়দংশ ও রকের কোন কোন অংশ ভগ্ন হইয়াছিল তাহা সংস্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা এখনও যেরূপ অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে, তাহাতে যদি সিংহীমারী নদী ইহাকে ধ্বংস্ না করে, তাহা হইলে, মহারাজ প্রাণনারায়ণের এই কীর্ত্তিস্তম্ভ যে অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

গোসানীমারই দেবী দর্শন বা গোসানীমারীতে আগমন করা মহারাজা ও মহারাজ কুমারগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই জন্য তাঁহারা এখানে আগমন করেন না *। কেবল মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ এই স্থানে আগমন করিয়া ইহাতে রাজধানী সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার কিছু দিবস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

তৎপরে প্রায় বেলা ৮টার সময়ে কমতেশ্বরের টাকশাল

* এইরূপ জন প্রবাদ যে দেবী কামতেশ্বরী গভীর রজনীতে নর্ত্তকীর রূপ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেন। এই মন্দির নির্ম্মিত হইলে পর, মহারাজ ইহা দেখিতে গমন করিয়া এই বিষয় শ্রবণ করতঃ মন্দিরের দ্বারের ছিদ্র দিয়া, দেবীর নৃত্য দেখিয়াছিলেন। দেবী ইহা জানিতে পারিয়া অভিশাপ প্রদান করেন যে, নারায়ণ বংশ সম্ভূত কোন ব্যক্তি এই মন্দির দর্শন করিলেই তাহার মৃত্যু হইবে।

বা ধনাগার দেখিতে যাত্রা করিলাম। ইহা একটী প্রকাণ্ড ইষ্টক স্তূপ নানা প্রকার ছোট ছোট গাছে আবৃত হইয়া আছে। ইহাই রাজার টাকশাল নামে বিখ্যাত। ইহা যে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল তাহা ইহার পরিসর ও ইষ্টক রাশি দৃষ্টি করিলেই অনুভব হয়। কমতেশ্বরের রাজত্ব কালের প্রচলিত মুদ্রা এখনও অনেকের নিকট আছে। এই মুদ্রাতে যে ভাষায় নাম খোদিত আছে সে লেখাগুলি পড়িতে পারা যায় না। এবং কি ভাষা তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না।

ধনাগারের কিছু দূর পশ্চিমে রাজপাট বা রাজভবন। রাজ পাটের চতুর্দ্দিক সুবিস্তৃত ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের নিম্নেই পরিখা ; ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৮৬০ ফিট ও উত্তর দক্ষিণে ১৮৮০ ফিট দীর্ঘ এবং ৬০ ফিট প্রশস্ত পরিখার দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরিখা ও ভগ্ন প্রাচীরের উপরি ভাগ দিয়া গমন করিলে রাশি রাশি ইষ্টক ও স্থানে স্থানে প্রস্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎপরেই সুবিস্তৃত মাঠ। এই মাঠের ঠিক মধ্যস্থানে একটি উচ্চ স্থান আছে। তাহার পরিসর প্রায় ৩৬০ বর্গ ফুট ও উচ্চে প্রায় ২০ হস্ত হইবে। ইহার চারিপার্শ্ব ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত আছে। ইহাই রাজপাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা যে পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়া ইহার উপরে উঠিলাম সেই পার্শ্বে ক্রমে ক্রমে চারিটি পুষ্করিণী দেখিতে পাইয়াছিলাম। রাজপাটের উপরি ভাগ মৃত্তিকা এবং বালুকা পূর্ণ ও ঘাসে আবৃত পরিষ্কার সমতল ক্ষেত্র। কোন বৃক্ষ বা জঙ্গল নাই। কেবল মধ্যস্থানে

একটি অশ্বথ বৃক্ষ আছে। আমি যাঁহার সহিত তথায় গিয়াছিলাম তিনি বলিলেন যে, "আমি ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বৃক্ষটিকে যত বড় দেখিয়াছিলাম আজও সেইরূপ দেখিতেছি।" স্থানীয় লোকেরা বলে যে, "আমরা বাল্যকাল হইতে ইহাকে একই রূপ দেখিতেছি"। রাজপাটের উপরে একটি কূপ আছে অট্টালিকাদির কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। কিছু দিবস গত হইল এক জন বৈরাগী ইহার উপর কুটির নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা পুড়িয়াগিয়াছে।

রাজপাটের উপরি ভাগ হইতে যখন চারিদিক দেখিতে লাগিলাম তখন বোধ হইতে লাগিল কে যেন, দূরবর্ত্তী বাঁশ ও অন্যান্য বৃক্ষ সকলের শিরোভাগ কেয়ারী করিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া আনন্দিত এবং এই বিশাল দুর্গের সুদূরবর্ত্তী গড়ের উপরি ও নিম্ন ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিলাম। নগরের তিন দিক এই গড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত। অপর দিকে ধল্লা নদী রক্ষক স্বরূপ হইয়া আছে। প্রাচীর পরিবেষ্টিত ভূভাগের মধ্যে রাজ অন্তঃপুর, শস্ত্রগৃহ ও অন্যান্য গৃহ ছিল। তন্মধ্যে কেবল দুইটী স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের চিহ্ন পাওয়া যায়। ইহাতে বোধহয় রাজ পরিবারগণ ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেন না। ইহার মধ্যে অনেক গুলি পুষ্করিণী ও উত্তর দক্ষিণে দুইটী কূপ আছে। এই সকল পুষ্করিণীর মৃত্তিকা দ্বারা রাজপাট নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। শুনিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বদিকে কমতেশ্বরীর মন্দির ছিল। গড়ের মধ্যস্থ সমুদয় ভূভাগের পরিধি প্রায় ৯৷৹ ক্রোশ। তাহার মধ্যে ২৷৹ ক্রোশ

ধল্লা নদীর দ্বারা ও ৭ ক্রোশ এই গড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে।

এই উচ্চ ভূমি খণ্ড ইহাতে অবতরণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় মাঠ পার হইয়া ভগ্ন প্রাচীরের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দূর হইতে একটী শালবন দেখা গিয়াছিল, তাহাতে প্রায় ৩০০০ শাল বৃক্ষ আছে। পরে এখান হইতে কিছু দূর গমন করিয়া কমতাপুরের কীর্ত্তিনাশোদ্যত সিংহীনারী নদী পার হইয়া গড়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। আমরা যে পথ দিয়া যাইতেছিলাম তাহা প্রাচীন পথ। প্রাচীন পথগুলি অতি উচ্চ ও কোন কোনটী অতি প্রশস্ত। উভয় পার্শ্ব বর্ষার জলে ধুইয়া যাওয়ায় স্থানে স্থানে উপরিভাগ গোলাকার হইয়াছে। এই পথটী নিম্ন ভূমির সহিত সমান করিলেও প্রাচীন পথের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা গেল।* ইহা দীনাজপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং ইহার ৩।৪ ক্রোশ ব্যবধানে এক একটী পুষ্করিণী আছে। এই পথটী এত প্রশস্ত যে, ইহার উপর দিয়া অনায়াসে ছয়খানি গাড়ি যাতায়াত করিতে পারে। এই পথের উভয় পার্শ্বে ছোট বড় প্রস্তর ও প্রস্তরে খোদিত মুসলমান সেনা কর্ত্তৃক ভগ্ন দেব ও দেবীর মূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে। আমাদের সঙ্গী স্থানীয় একটী লোক বলিল যে, "এই সকল প্রস্তর ও দেব দেবী কান্তেশ্বরের রথে ও তাহাতে চাকা সংযুক্ত ছিল এবং তাহা চলিত"। কিন্তু আমরা কান্তেশ্বরীর ও মহাদেবের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া অনুমান করিলাম। এই সকল র্ত্তির মধ্যে একটী ছোট স্ত্রী মূর্ত্তি আজও "শুভচুন্নি" নামে

পূজিত হয়। লোকে তাঁহার নিকট শুভ কামনা করে এবং মনস্কামনা পূর্ণ হইলে পান "গুয়া" (সুপারি) ও মস্তকে তেল দিয়া পূজা করিয়া থাকে। এক স্থানে একটি স্তম্ভ পতিত আছে, তাহা মাপিয়া দেখিলাম দৈর্ঘ ৮৷৷০ হস্ত ও ব্যাস প্রায় ৫ হস্ত হইল। আর এক খণ্ড প্রস্তরে হর-পার্ব্বতীর খোদিত মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দু দেবদেবী ভগ্নকারি যবন সেনা এই মূর্ত্তিদ্বয়ের নাসিকা ভগ্ন করায়, মুখের অন্যান্য আকৃতি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। নাসিকা নাই বলিয়া এখন "নাককাটা" ও "নাক্‌কাটি" * নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে!! ইহা যে হর-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি তাহা বোধ হয় সাধারণে জ্ঞাত নহে।

এইরূপ দেখিতে দেখিতে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে স্থানীয় লোকটি পথের উত্তর পার্শ্বস্থ আদাবাড়ী তালুকের অন্তর্গত একটি দূরবর্ত্তী উচ্চ স্থান দেখাইয়া বলিল যে, "উহা দুবাইর নামক রাজার কোট। দুবাই নামক রাজা এক দুপুরের (দুইপ্রহর) মধ্যে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" তৎপরে আমরা হরিবোলার হাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে কতকগুলি ছোট বড় প্রস্তর ও দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে একটি বড় গৌরীপীঠ ও এক খোদিত প্রস্তর খণ্ডে মহাদেব দুই বাহু পাশে দুইটি স্ত্রী মূর্ত্তি ধরিয়া আছেন দেখা গেল। ইহার চারিদিকে অনেক প্রস্তর পতিত আছে দেখিয়া বোধ হইল-

---

* হোসেনসার সৈন্য এই স্থানে রাজ সৈন্যের নাক কাণ কাটায় ইহা "নাক কাটা ও নাক কাটী" নামে [illegible] য়ানীমঙ্গল)

যে, এই স্থানে শিব মন্দির ছিল। বিহারস্থ রাজবাটীর সম্মুখে অনেকগুলি সুন্দর কাজকরা স্তম্ভ ও দরজা বা খিলানের প্রস্তর পতিত আছে, তাহা এই মন্দিরের বলিয়া বোধ হয়। ঐ স্তম্ভ গুলির মধ্যে যে গুলিতে কাজ করা আছে, তাহা দৈর্ঘে ৪৷৷০ হস্ত অপর গুলি প্রায় ৫ হস্ত এবং ব্যাস ২৷৷০ হস্ত। সময়ে সময়ে কোচবিহারের রাজাগণ এখান হইতে ঐ সকল প্রস্তর তথায় লইয়াগিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ১৮০৯ খৃঃ অব্দে গড়ের বাহিরে একটি অতি বৃহৎ স্তম্ভ পাওয়া যায়। তাহা দৈর্ঘে ২৩ হস্ত ব্যাস প্রায় চারি হস্ত হইবে। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ তাহা এখান হইতে লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু পথি মধ্যে গাড়ি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় স্তম্ভ-টীও ভাঙ্গিয়া দুই খণ্ড হইয়াছিল। হাটের পশ্চিমে নাগ ও নাগিনীর মূর্ত্তি দেখিলাম। এই মূর্ত্তি সকল দেখিলে শিল্পকারের শিল্প নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল "কীর্ত্তিযস্ত-সঞ্জীবতী" কীর্ত্তিমান পুরুষেরা মরিলেও জীবিত থাকেন আর দুরাচার পাষণ্ডের অত্যাচার অপযশঃ চিরদিন ঘোষিত হয়। কত শতাব্দি গত হইল রাজা নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বরের (কান্তেশ্বরের) নশ্বর দেহ শূন্যে বিলিন হইয়া-গিয়াছে, কিন্তু আজও তাঁহাদিগের কীর্ত্তি স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মন স্তম্ভিত হইতে লাগিল। প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজমন্ত্রী ও বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ড হোসেন সার নামও তাঁহাদিগের নামের সহিত স্মরণ হইল। ভাবিলাম যদি

রাজা নীলাম্বর ক্রোধের বশীভূত হইয়া, মনোহরের মৃতদেহের মাংস তৎপিতা শশী পাত্রকে ভোজন না করাইতেন, তাহা হইলে হয়ত ঐ রাজ্য হোসেন সা কর্ত্তৃক এরূপে ধ্বংশ হইত না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হাটের চারি-দিক দেখিতে লাগিলাম।

হাটের পশ্চিম দিকে একটি দীঘী আছে। ইহা মাপিয়া দেখা গেল পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৯০॥ হস্ত ও উত্তর দক্ষিণে ১৪৬ হস্ত। ইহার চতুষ্পার্শ্ব ইষ্টক দিয়া গাঁথা তাহার স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া আছে। ইহাতে চারিটি ঘাট আছে, তাহার মধ্যে তিনটি ঘাট প্রস্তর নির্ম্মিত ও পূর্ব্ব ঘাটটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ২০টি সিঁড়ি উপরি ভাগে এবং জল মধ্যে আরও আছে দেখা গেল। ঘাটের উভয় পার্শ্বে ইষ্টক নির্ম্মিত দীর্ঘ ও প্রশস্ত চাতাল জঙ্গলে আবৃত কেবল তাহার কিয়দংশ দেখিতে পাইলাম। দক্ষিণের ঘাটে ২২টী সিঁড়ি আছে এবং উপরিভাগে কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও জল মধ্যে আরও আছে বোধ হইল। এই ঘাটের উত্তর পার্শ্বে অনেকগুলি প্রস্তর পড়িয়া আছে। একখানি সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রস্তর মাপিয়া দেখিলাম দীর্ঘে প্রস্থে ৪ ও ২হস্ত হইল। পশ্চিমের ঘাটটী একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার সিঁড়ির প্রস্তরগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহা দ্বারা আর জলে অবতরণ করা যায় না। এই দীঘির চতুর্দ্দিক ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ইহার নিকটেই মুসলমান সেনাপতি তাঁহার ও তাঁহার প্রিয়তমা লালা বায়ের বাস ভবন নির্ম্মাণ করি-

য়াছিলেন। দীর্ঘিকা পূর্ব্ব পশ্চিমে অধিক লম্বা এবং প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ বলেন যে ইহা মুসলমান মহিলাদিগের জন্য মুসলমানেরা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না। গোসানী মঙ্গল গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, এই নগর প্রভৃতি ও মহাদেবের মন্দির এবং এই দীঘী এক সময়ে নির্ম্মিত হয়। তবে ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে মুসলমানেরা এই দীঘীকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করতঃ তাহাদের ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া লইয়াছিল। এখন ইহা "ভোনাথের দীঘি" (ভোলানাথের) নামে বিখ্যাত। শুনিলাম এই দীঘীর ১৷৹ ক্রোশ পশ্চিমে তালুক মরিচার মধ্যে "রাজা মায়ের দীঘি" নামক এক অতি বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে তাহা ইহাপেক্ষা চারিগুণ বৃহৎ ও চারি দিক ইষ্টক দ্বারা বাঁধান। উহা দেখিতে আর গমন করিলাম না।

তৎপরে আমরা কিছু দূর পশ্চিমে গিয়া গড়ের উপরে উঠিলাম। নিম্নে বাঘ দুয়ারের ইষ্টক ও প্রস্তর চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। এই দুয়ারে ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি ছিল বলিয়াই ইহাকে বাঘ দুয়ার বলে। এখান হইতে পূর্ব্বোক্ত রাজপাট ও তাহার উপরিস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষটি এবং নগরের শোভা অতিসুন্দর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বাঘদুয়ারের উত্তরে হোকদুয়ার। তাহার নিকটে একটা দুর্গ আছে। ঐ দুর্গের পরিমাণ প্রায় এক বর্গ মাইল। ইহাতে মন্ত্রী বাস করিতেন ইহার উত্তরে শীতলাবাস নামক রাজার

স্নান গৃহ ছিল কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন নাই। হোকোদিয়ার দেখিতে আমরা গমন করি নাই।

আমরা গড়ের উপর দিয়া নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলাম। গড়ের মধ্য এবং বহির্দ্দেশে পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহাতে জল বা ইহার গভীরতা প্রায় নাই, অতি নিম্ন ভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল নিম্ন স্থানে ধান্য আবাদ হইয়া থাকে। গড়ের নিম্ন ভাগ প্রায় ৪৬ হস্ত ও উচ্চে প্রায় ২৫।৩০ হস্ত হইবে। আমরা যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম তত একটির পর একটি পূর্ব্বোক্ত পথের ন্যায় উচ্চ উচ্চ স্থান পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে গড়ের অভি-মুখে আসিয়াছে দেখিতে পাইলাম কিন্তু সে গুলি যে কি তাহা অনুমান করিতে পারি নাই। নগরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য ও নগর হইতে বাহিরে যাইবার জন্য স্থানে স্থানে গড় কাটিয়া পথ করা হইয়াছে। বাঘ দুয়ারের প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে শিল দুয়ার। ইহা জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া আছে। শুনিলাম ঐ বনের মধ্যে ব্যাঘ্র বাস করে এবং রজনীতে তথা হইতে নির্গত হইয়া নগরের মধ্যে সময় সময় প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহা এখনও এরূপ জঙ্গলে পূর্ণ যে, আমরা ইহার অতি নিকট দিয়া গমন করিলেও দ্বারের বিষয় বিশেষ কিছুই জানিতে পারিলাম না। কেবল কতকগুলি ইষ্টক পতিত আছে ইহাই দেখিতে পাইয়াছিলাম।

সিংহীমারী নদী যে স্থান দিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ ও যে স্থান দিয়া নগরের সীমা পরিত্যাগ করিয়াছে সেই সেই

স্থানের কীর্ত্তি লোপ পাইয়াছে। আমরা শেষোক্ত স্থানে পুনরায় নদী পার হইয়া গোসানীমারী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ধল্লা নদীর পশ্চিম তীরে জয়দুয়ার নামে একটী দ্বার ছিল। সেই স্থানে যবন সেনা আপনাদের শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। কিন্তু এখন ইহার বিশেষ কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এই বিশাল দুর্গের পূর্ব্বে কেবল এই চারিটী মাত্র দ্বার ছিল। প্রত্যেক দ্বার রাজপাট হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইবে।

রাজা নীলাম্বর কমতেশ্বরীর মন্দির ও অন্যান্য রাজপ্রাসাদ সকল নির্ম্মাণ করিয়া একটী প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রস্তরাদি সংগ্রহ করিতে ছিলেন ইতি মধ্যে মুসলমানেরা নগর আক্রমণ করিবে শ্রবণ করিয়া তিনি তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ ও নগর রক্ষার জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সুবিস্তৃত গড় ও উভয় পার্শ্বস্থ পরিখার দ্বারা নগর পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রাচীন কীর্ত্তির ন্যায় এই গড়ও বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বলিয়া বিখ্যাত। এই রূপ কথিত আছে যে, দেবী কমতেশ্বরী রাজাকে চারিদিবস উপবাসী থাকিতে স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন কিন্তু রাজা তিন দিবস অনাহারে ছিলেন। সেই জন্য তিনদিকে গড় নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা নিলাম্বরের অপর নাম কান্তেশ্বর। এই শেষোক্ত নামেই প্রাচীন কীর্ত্তি সকল বিখ্যাত। যেমন কান্তাপুর, কান্তেশ্বরের পথ এবং দেবীও তাঁহার নামানুসারে কান্তেশ্বরী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর।
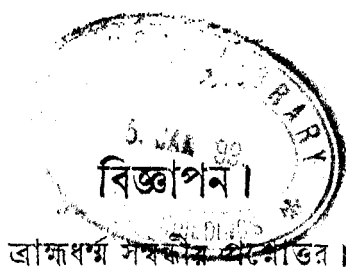
প্রথম ভাগ।

মত ও বিশ্বাস।

মূল্য এক আনা। অর্দ্ধ আনা ডাক মাশুলে
পাঁচ খণ্ড যাইতে পারে।

কলিকাতা, ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যালয়ে এবং কোচবিহারে শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় দ্বয়ের বাসা বাটীতে পাওয়া যাইবে।